দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রলীগ কী ভয়ংকর?

মো. আবু সালেহ সেকেন্দার

ছাত্রলীগ কর্তৃক পুরাতন ঢাকার দর্জি ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাসকে হত্যার ঘটনা দেশ-বিদেশে আড়োলন সৃষ্টি করেছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, ছাত্রলীগের রাজনীতির অন্ধকার দিকের নানা বিষয় নিয়েও। তবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও সরকারের ওপর মহলের নানা তৎপরতার কারণে অচিরেই ধরা পড়েছিল বিশ্বজিতের খুনিরা। ওই ঘটনার পর ছাত্রলীগ ও সরকারের আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকেই মনে হয়েছিল যে, হয়তো ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের অবসান হবে। কিন্তু বিধিবাম! আজও চলছে, তাও আবার সগৌরবে! অতিসম্প্রতি চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের গুলি বিনিময়ে দুই পথচারী নিহত হওয়ার ঘটনা আমাদের আর একবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, 'ছাত্রলীগ ভয়ংকর।' আর ওই ভয়ংকর ছাত্রলীগই আগামী নির্বাচনে মহাজোট সরকারের, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের প্রধান কারণ হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

নিরীহ পথচারী বিশ্বজিৎ দাস হত্যার পরও ছাত্রলীগ নানা ধরনের অপকর্মে জড়িয়েছে। ওইসব অপরাধের ফিরিস্তি দিতে গেলে ওই ঘটনাগুলো নিয়ে একটি থিসিস লেখা অসম্ভব নয়। বিশ্বজিৎ দাসের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটই ওই ঘটনার পর বহুবার নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। লাঞ্ছিত করেছে মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন নীল দলের আহবায়ক, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সহকারী প্রক্টরসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি সাধারণ ছাত্র, সাংবাদিক, মুক্তিযুদ্ধের সন্তান বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক প্রমুখ। আর প্রতিনিয়ত একপক্ষ অপরপক্ষকে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করার মতো ঘটনাতো রয়েছেই। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের মতো সারাদেশে প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়তই সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে লিপ্ত রয়েছে। ঢাকা কলেজ অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জগন্নাথ হলের মতো কোথাও তারা অন্তঃকলহে লিপ্ত হয়ে গুলাগুলি করে জনমনে আতংক ছড়াচ্ছে। আবার কোথাওবা সিলেট এমসি কলেজের মতো আগুন দিয়ে ছাত্রবাস পুড়িয়ে দেয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারে বহিরাগতদের নিয়ে অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে। আর চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, ফাও মদ খেতে না দেয়াতে রাস্তা অবরোধ, ফাও চমশা না দেয়াতে ব্যবসায়ীকে মারধর, পরীক্ষার হলে পিস্তল দেখিয়ে শিক্ষককে ভয় প্রদর্শন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে লড়াকু সৈনিক সাংস্কৃতিক কর্মীদের মারধর, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস প্রভৃতি ঘটনা প্রায় নিয়মিতই ঘটাচ্ছে। এভাবে চলছে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এই সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বাংলাদেশ ছাত্রলীগ স্বাধীনতার পর হতেই পথ হারিয়েছে। এই সংগঠনের কতিপয় নেতার ক্ষমতালিপ্সা, দ্রুত ধনী হওয়ার স্বপ্ন ও সুযোগ সন্ধানীদের ষড়যন্ত্রই ছাত্রলীগের মূল চেতনাকে গ্রাস করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ই পথভ্রষ্ট কতিপয় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ছাত্রলীগের মূল চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে লুটতরাজের উৎসবে মেতে উঠেছিল। "মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর" গ্রন্থে মঈদুল হাসান মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, '(মুক্তিযুদ্ধের সময়)...ফার্মগেটের কাছে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে তাদের কাছ থেকে টোল আদায় করা হতো, মুক্তিপণ আদায় করা হতো। এমনকি কেড়ে নেয়া হতো অবাঙালি পরিবারের কাছ থেকে সোনার গয়নাপত্র।...এসব ঘটনা যারা ম্যানেজ করেছে, তারা কিন্তু অজ্ঞাতনামা কোন মানুষ ছিল না বা সাধারণ দুষ্কৃতিকারীও ছিল না। এরা অনেকেই ছিল স্থানীয় ছাত্রলীগেরই পরিচিত নেতা-কর্মী' (পৃ. ১৪০)। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শুরু হওয়া ওই লুটতরাজের উৎসব আজ ৪২ বছর পর এসে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে শুধু ছাত্রলীগ দায়ী অথবা ছাত্রনেতারা দায়ী বিষয়টিকে এমন সহজ-সরলীকরণ করার সুযোগ নেই। ছাত্রলীগের প্রতি বঙ্গবন্ধুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে কতিপয় সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করেছেন ছাত্রলীগের নেতাদের। এর বিনিময়ে তারা ছাত্রনেতাদের অঢেল অর্থ, গাড়ি, বাড়ি উপহার প্রদান করেছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনারও ছাত্রলীগের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। ফলে সুযোগ সন্ধানীরা তাদের স্বার্থ উদ্ধারে অহরহ ছাত্রলীগের ছেলেদের ব্যবহার করছে। তাইতো চাকরির নিয়োগ থেকে হাট-বাজারের ইজারাদারি বরাদ্দ পর্যন্ত ছাত্রলীগের প্রভাব খাটানোর ঘটনা আমরা নিয়মিতই গণমাধ্যমের কল্যাণে জানছি। এক্ষেত্রে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাও ধুয়া তুলসী পাতা বিষয়টি এমন নয়। তারাও দ্রুত অর্থ-বিত্তের মালিক হতে, বেপরোয়া জীবনের স্বাদ পেতে ওইসব স্বার্থান্বেষী মহলের টোপ গিলছে।

একজন ছাত্রনেতার কাজ কখনও টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ হতে পারে না। ছাত্রনেতারা ছাত্রদের কল্যাণে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক। আমি আজও কোথাও শুনিনি যে, ছাত্রদের কল্যাণে অথবা ছাত্রদের কোন ন্যায্য দাবি আদায় করতে যেয়ে কোন ছাত্রলীগ নেতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। আমরা পত্রিকার পাতা খুললেই প্রায় প্রতিদিনই দেখি যে, কোন না কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের কোন নেতা বা কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ওইসব বহিষ্কারের প্রায় শতভাগ কারণই শিক্ষক লাঞ্ছনা, ছাত্রীদের সাথে অশালীন আচরণ, ক্যাম্পাসে নিজ আদর্শের প্রতিপক্ষ গ্রুপের সাথে মারামারির ঘটনা, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি প্রভৃতি।

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী কর্তৃক সংঘটিত অপরাধগুলো সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে প্রকাশ পাওয়াতে জনমনে এই ধারণা তৈরি হচ্ছে যে, ছাত্রলীগ রগকাটা শিবিরের মতোই সন্ত্রাসের পথে হাঁটছে। কিন্তু আমরা যদি একটু অতীতে ফিরে যাই, তবে ছাত্রলীগের সোনালী দিনের পতাকা বাংলার আকাশে উড়ছে এমনটি দেখতে পাব। খুঁজে পাব স্বাধীনতার সূর্যতরুণদের। দেখতে পাব ছাত্রলীগের মাতৃগর্ভ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মদাত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্মের সেই সোনালী ইতিহাস। সন্ধান পাব ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় নিশান উড়ানোর নেপথ্যের কারিগর হিসেবে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের। আজও সোনালী যুগের ইতিহাস হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ছাত্রলীগের অতীত ইতিহাস: ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ছয় দফা, ছাত্রদের এগার দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগের ভূমিকা...।

কিন্তু ইতিহাস তো ইতিহাসই। মানুষ ইতিহাসকে মনে রাখলেও বিচার করে বাস্তবতার নিরিখে। ছাত্রলীগও গণমানুষের ওই বিচারের ঊর্ধ্বে নয়। বর্তমানে ছাত্রলীগের রক্তপিপাসু ভূমিকা তার অতীতকে তাই কলংকিত করছে প্রতিনিয়ত। গত চার বছর তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম যেভাবে সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে, তা জনমনে এই ধারণা তৈরি করছে যে, ছাত্রলীগ সত্যিই ভয়ংকর! টেণ্ডারবাজি করতে যেয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে বুয়েটের সানি হত্যার ঘটনা আজও কেউ ভুলেনি। কিন্তু অনেক মানুষই ভুলে গেছে স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদলের ভূমিকার কথা। তেমনি ছাত্রলীগের অতীতের সোনালী ইতিহাস কয়জনইবা জানে অথবা জানতে চায়। এমনকি ছাত্রলীগের সব নেতা-কর্মীইবা কতটুকু জানে? কিন্তু রাস্তাঘাটে, পথে-প্রান্তরে, শহর-বন্দর-লোকালয়ে অথবা চায়ের দোকানে, আবাল-বৃদ্ধ- বনিতা, সাধু অথবা চোর, বিধবা অথবা সদধা, চাকরিজীবী অথবা বেকার যুবক কারুরই ছাত্রলীগের ভয়ংকর রূপ অজানা নয়। গত চার বছর তিলে তিলে যা তাদের মনে জায়গা করে নিয়েছে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও যার প্রভাব পড়েছে, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনেও পড়বে। জানি না, এমন কোন ডিটারজেন্ট পাউডার আছে কি না যা দিয়ে সাধারণ মানুষের মন থেকে ছাত্রলীগের ওই ভয়ংকর রূপ মুছে ফেলা যাবে। এমনটি যদি সম্ভব না হয়, তবে যখন ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট চাইবে, গণসংযোগ, মিছিল-মিটিং করবে, তখন ছাত্রলীগের ভয়ংকর রূপ মনে করে মানুষের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে, ভয়ে পালাবে। ফলে ভোটের মোড় হয়তো ঘুরে যাবে।

পরিশেষে, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ও সরকারের নীতিনির্ধারকদের উচিত এখনই ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরা। ছাত্রলীগের পদ-পদবিধারী নেতাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে গোপন প্রতিবেদন তৈরি করা। আর যদি কোন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, টেণ্ডারবাজিতে জড়িত হওয়ার আশংকা থাকে, তবে তাকে দল থেকে এখনই অব্যাহতি দেয়া। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দল থেকে বহিষ্কারই সমস্যার সমাধান নয়। ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে ছাত্রলীগ যে নষ্ট রাজনীতির পথে হাঁটছে, তা ছাত্রলীগ ও সরকার কারুর জন্যই মঙ্গলজনক হবে না, সে কথা হলফ করে বলা যায়।

● **লেখক : শিক্ষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়**
salah.sakender@gmail.com